

📖 বেলা ফুরাবার আগে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নাস্তিক্যবাদের প্রভাব ও একজন বর্ষার গল্প

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

নাস্তিক্যবাদের প্রভাব ও একজন বর্ষার গল্প

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম এসেছিল অনেক আগে। এদেশে ইসলামের আগমন সুপ্রাচীন, সমৃদ্ধ ইতিহাস সেটা। লোকসমাজে বহুল প্রচলিত, সর্বপ্রথম বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ বিজয় করেন। কিন্তু বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের বহু আগ থেকেই এখানে মুসলিমদের বসবাস ছিল। সেই সাহায্যে কেরামের যুগেই ব্যবসার সূত্র ধরে এদেশে ইসলাম এসেছিল। মুসলিমদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা এদেশের সকল প্রজার মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাই অসংখ্য হিন্দু, আর্য, ব্রাহ্মণ মুসলিম হতে থাকে। এমনকি ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু শাসকও বহু আগ থেকেই ইসলামের প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিলেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন।

পুনরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, ‘চেরর (মালাবার) রাষ্ট্রের শেষ রাজা চেরামাল পেরুলাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কানগরীতে গমন করেন।’ [বাংলার ইতিহাস : পৃ. ১৫৮]

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তার অভিষেক অনুষ্ঠানকালে তলোয়ার তুলে ধরে আরবীতে উচ্চারণ করতেন, ‘মক্কা হইতে আমার পিতৃব্যের ফিরিয়া আসা পর্যন্তই আমি এই তরবারী ধারণ করিব।’ [প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৮]

মুসলিমদের ত্যাগ-তিতিক্ষায় গড়া এই হিন্দুস্তানে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহভোলা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বৃদ্ধি পেতে থাকল আল্লাহদ্রোহী তাগুতী শক্তির। এই তাগুতী শক্তির সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হলো নাস্তিক্যবাদ। নাস্তিক্যবাদের হাত ধরেই বর্তমান পৃথিবীর সকল তাগুতী শক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও মুসলিমকে নিশিহ্ন করার হীন উদ্দেশ্যে উঠেপড়ে লেগেছে। মুসলিম আজ দেশে দেশে নির্যাতিত, নিপীড়িত নিপেষিত। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও এদের খড়্গহস্ত থেকে মুক্ত নয়। নব্বইভাগ মুসলমানের এই দেশে আজ নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ্যে আশ্ফালন দেখাচ্ছে। দেশ ও জাতির দুশমন সাম্রাজ্যবাদীদের দোসররা এদেশে ইসলামের সমাধি রচনা করতে চায়। ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টিকালচার উৎখাত করে এই পবিত্র জমিনকে বানাতে চায় পাশবিক নৃত্যের রঙ্গমঞ্চে। প্রগতির ধূয়া তুলে দিতে চায় এইডস সভ্যতা। যার হাতিয়ার পর্দাহীন খোলামেলা নারী, উচ্ছৃঙ্খল নারী।

নাস্তিকতা কী? নাস্তিকতা হচ্ছে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী, আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করার শয়তানী মতবাদ। নাস্তিক্যবাদিরা আল্লাহ তা‘আলার অসীম ক্ষমতা, অপার কুদরত, সুবিশাল মালিকানা ও যাবতীয় গুণাবলী অস্বীকার করে। জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে অসম্ভব জ্ঞান করে। তাদের ধারণা, এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এর কোনো ব্যবস্থাপক নেই। নাস্তিকদের মতবাদ হল, Nature never breaks her own law অর্থাৎ ‘প্রকৃতি কখনো তার স্বভাব ভঙ্গ করে না।’ একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সামনে রেখে তাদের জীবন পরিচালিত করে। এটা যে সর্বৈব মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

বস্তুতঃ নাস্তিকরা সত্যের অপলাপকারী, সত্যে অবিশ্বাসী। তারা শুধু বস্তুবাদে বিশ্বাসী। বস্তুবাদের রূপই হল নাস্তিকতা। এই মতবাদের জনক হচ্ছে ডারউইন, হিউম, হেগেল, এঞ্জেলস, মার্ক্স প্রমুখ।

একজন স্রষ্টার প্রতীতি সমগ্র মানুষের রক্ত-কণায় মিশে আছে। এছাড়া সে নিজের মধ্যে বিরাট শূন্যতা অনুভব করে; শান্তির ঠিকানা খোঁজে পায় না। এটা তার চিরন্তন উদ্দীপনা। ‘স্রষ্টার পরিচয় লাভ’ সে উদ্দীপনারই বাস্তব ঠিকানা। কিন্তু যারা স্রষ্টার পরিচয় লাভে ব্যর্থ হন, তারা অন্য কোনো কৃত্রিম জিনিসকে উপাস্যের আসনে বসান। একজন নেতা যখন কোনো মহান ব্যক্তিত্বের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়ান, তখন তিনি সে কাজেরই পুনরাবৃত্তি করেন, যা একজন ধর্মিক নিজের মাবুদের জন্য রুকু ও সেজদার মাধ্যমে করে থাকেন। একজন কম্যুনিষ্ট যখন কালমার্ক্স বা লেনিনের প্রতিমূর্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় চলার গতি কমিয়ে মাথা নত করে চলেন, তখন তিনিও নিজের ‘উপাস্য’ সমীপে আপন ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু নিজের বাবাকে ছেড়ে সন্তান যখন অন্যকে বাবা বলে ডাকে, বাবা তখন বড় রুষ্ট হন। এ রুষ্ট আচরণনীতি একজন নগণ্য মানুষের বেলায় যথার্থ হলে পরাক্রমশালী স্রষ্টার বেলায় কেন তা সঙ্গত হবে না! প্রকৃতি ও বিজ্ঞানে স্রষ্টার অস্তিত্বের ওপর অজস্র প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলছি। তদস্থলে কৃত্রিম জিনিস এমনকি স্বয়ং বিজ্ঞানকে উপাস্যের আসন দিচ্ছি। ‘Nature nevar breaks her own law’ তথা ‘প্রকৃতি ও বিজ্ঞান আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণা করছে’- এটি একটি পরাবাস্তব কথা। ‘আল্লাহ আছেন’ এই চরম সিদ্ধান্তটি যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, তেমনি ‘আল্লাহ নেই’ এই প্রকল্পটিও প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহকে অস্বীকার করা যেতে পারে, যেমন অস্বীকার করেছেন- লামর্ক, ওয়ালেস, ডারউইন, কালমার্ক্স, লেনিন- কিন্তু নাস্তিকেরা তাদের অস্বীকারের পক্ষে যুক্তিধর্মী কোনো কিছু কোনোদিন প্রকাশ করতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে যাদের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞান সীমিত ছিলো, তারাই কেবল স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে। গভীর জ্ঞানের দার্শনিকরা কখনো স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারেননি। ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, ‘সামান্য দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর সুগভীর দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের দিকে টানে।’

স্রষ্টা তো দূরের কথা- স্যার জেমস জিসের মত একদল অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক এই বিশ্বলোকের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। আর সৃষ্টিকে অস্বীকার করলে স্রষ্টার অস্তিত্বও ঠিক থাকে না। তারা বলেন, বিশ্বলোক ও তার বস্তুনিচয় কল্পনামাত্র। তাদের ভুল ভাঙ্গনের জন্য লোহার শলাকা তাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, ভাই, ব্যথা পেয়েছেন? যদি বলে হ্যাঁ, তবে এই তো বাস্তব জগত। নয়ত আপনি ব্যথা পেলেন কেন? আরেক দল নাস্তিক বা প্যাগানবাদী বিশ্বলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তার একজন স্রষ্টা ও পরিচালক থাকার কথা স্বীকার করতে রাজী নন। তারা বলেন, সম্পূর্ণ শূন্য থেকে স্বতঃই বিশ্বের অস্তিত্ব জেগে উঠেছে এবং আপনা আপনি তা পরিচালিত হচ্ছে। পিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যাবিদ, অধ্যাপক এডউইন বলেছেন, ‘দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বলোকের অস্তিত্ব লাভ এবং স্বতঃই তা বিন্যাসিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো ছাপাখানায় বিস্ফোরণের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিন্যাসিত হয়ে একটি বিরাট অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।’

নভোমণ্ডল বিষয়ক অধ্যয়নে খগোলবিদদের থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রতীরে যত বালুকণা আছে, সম্ভবত মহাশূন্যে সে পরিমাণ তারকা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু তারকা এত বড় যে, তার মধ্যে লক্ষ পৃথিবী, কোনোটিতে কোটি পৃথিবী সঙ্কলান হতে পারে। এই বিশ্বলোক এতই বিশাল, আলোর মত তীব্র গতিশীল কোনো আকাশযান যদি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে বিশ্বলোকের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে, তবে সমগ্র দূরত্ব অতিক্রম করতে সম্ভবত এক হাজার কোটি বছর লাগবে! পিলোমার ওপর স্থাপিত এয়ুগের সবচে’

দূরদর্শনের টেলিস্কোপে চোখ রাখলে কয়েকশ’ কোটি তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র বিশ্বলোক এরকম অগণিত অগণন নক্ষত্রের চাকে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একেকটি ‘চাক’কে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। এ ছায়াপথগুলো ক্রমাগত আবর্তনমুখর।

চাঁদ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীর চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। আর পৃথিবী সূর্যের চারপাশে তার পরিক্রমা পূর্ণ করছে সাড়ে নয় কোটি মাইল দূর থেকে। এভাবে পৃথিবীসহ নয়টি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে নিরন্তর দৌড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এসবের চারপাশে একত্রিশটি চাঁদ নিজ নিজ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। তদুপরি শত সহস্র ধূমকেতু ও সংখ্যাতিত উল্কামালা একই রকম আবর্তনে লিপ্ত। এসবকে অধীনে রেখেছে সূর্য। তার ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় বারো লক্ষগুণ বড়। এ সূর্য নিজের সমগ্র গ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জসহ বিশাল এক গ্যালাক্সির মধ্যে ঘণ্টায় ছয় লক্ষ মাইল গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। আর প্রতিটি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের মধ্যে বিপুল গ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জ বেষ্টিত সূর্যের মত একলক্ষ বিলিয়ন কিংবা তার কিছু কম-বেশি নক্ষত্র রয়েছে।

মহাকাশবিদদের অনুমান মতে- সমগ্র বিশ্বলোকে এজাতীয় প্রায় পাঁচশত মিলিয়ন ছায়াপথ আছে। আমাদের সৌরলোকের ছায়াপথটি এমনভাবে পরিভ্রমণ করছে যে, বিশ কোটি বছরে তার একবারের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। আমাদের এই ছায়াপথ আবার যে ছায়াপথের অংশ, তার ব্যাস বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ। এটিও নিরবচ্ছিন্ন গতিবান।

মহাশূন্যের এসব সৃষ্টি নিতান্ত সুসংহত। তাদের গতি ও আবর্তন বড় নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল। তাদের গতিতে কোনো ব্যাঘাত নেই; পরস্পরে কোনো সংঘর্ষ নেই। এই অথৈ অন্তহীন বিস্ময়কর সুসংবদ্ধতা দেখে যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে- এসব স্বতঃই সৃষ্ট এবং স্বয়ংচালিত নয়; বরং কোনো মহাশক্তি তা সৃষ্টি করে এ অন্তহীন ব্যবস্থা কার্যকর রেখেছেন। সেই সঙ্গে সুস্থ মস্তিষ্কে স্বীকার করতে হবে- এসব এবং তার শিরোবিন্দু মানুষ সৃষ্টির পেছনে সেই মহাশক্তির স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন লিখেছেন, ‘যে মানুষ নিজের এবং অন্যান্য জীবের জীবনকে অর্থহীন জ্ঞান করে সে কেবল হতভাগা নয়, অধিকন্তু তার জীবন মূল্যহীন।’

স্রষ্টায় কতিপয় অবিশ্বাসী প্রশ্ন তোলেন- এই বিশ্বলোক কোনো স্রষ্টার সৃষ্টি হলে তবে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? প্রখ্যাত বৃটিশ গাণিতিক বার্ট্রান্ড রাসেল এই জবাব খুঁজে পাননি বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ‘আল্লাহ’ বলে কিছু নেই। এর মানে বিশ্বমণ্ডলের স্রষ্টা মেনে নিলে অবশ্যই তাকে অনাদি মেনে নিতে হবে। আর স্রষ্টাকে অনাদি মেনে নিলে বিশ্বলোককে অনাদি মানতে সমস্যা কোথায়? প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের এই থিওরি ভুলের দুর্বল ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা সৃষ্টিকর্তা বা শাস্ত্র মেনে নেয়ার মত কোনো ‘বিশেষত্ব’ এই বিশ্বলোকের মধ্যে আজো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তদুপরি ঊনবিংশ শতাব্দির পর আবিষ্কৃত ‘Nature and science speak about Allah’ তাপ-গতির দ্বিতীয় সূত্রটি তাদের যুক্তি-পদ্ধতির দুর্বল ভিতটি বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

তাপ-গতিবিদ্যার এ সূত্রটি বলছে, তাপ অনবরত নিম্ন তাপের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু তার বিপরীত দিকটি অসম্ভব- অর্থাৎ নিম্নতাপ থেকে উচ্চতাপের দিকে সংক্রমিত হওয়া। সুতরাং প্রমাণিত হলো- এই বিশ্ব তাপ বিকিরণ করতে করতে ক্রমশঃ নিম্ন তাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটি সময় আসা অনিবার্য, যখন তাপশক্তি বলে আর কিছু থাকবে না। এ বিশ্বলোক যদি সত্যিই অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান থাকত, তবে এ অসীম সময়ের ব্যবধানে এতক্ষণে বিশ্বের সে অবস্থা ঘটত এবং পৃথিবীতে এক্ষণে কোনো জীবনের মৃদু স্পন্দনও বাকি থাকত না। কিন্তু তেজস্বী সূর্য ও প্রাণ-সমৃদ্ধ পৃথিবী প্রমাণ করছে, বিশ্বজগত একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। তাপ-গতির এই নবতর আবিষ্কারের উদ্ধৃতি দিয়ে আমেরিকার প্রাণী বিজ্ঞানী Second law of thermo-dynamic

বিশ্বলোকের নিজস্ব ‘সূচনা’ থাকার কথা প্রমাণ করেছেন। আর বিশ্বের সূচনা ও সৃষ্টি হওয়ার কথা প্রমাণিত হওয়ায় একজন সূচনাকারী ও স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যেমন কোনো লেখা দেখলে একজন লেখকের অস্তিত্ব স্বতঃই উপলব্ধিতে আসে।

কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক প্রমাণের উপর চরম ও সন্দেহাতীত যে প্রমাণটি বিদ্যমান তা হলো- যুগে যুগে স্রষ্টার অগণিত সাক্ষী তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। আপনি হয়ত বলবেন তারা মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু তাদের পূর্বাপর নিষ্কলুষ জীবন- চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মিথ্যুক বলার কোনো অবকাশ থাকে না। একথাও বলা চলে না যে, তারা ভ্রমে ছিলেন। কারণ দশ-বিশজন কিংবা একশ’-দুশ’ জন লোক হয়ত ভ্রমে থাকতে পারেন, কিন্তু ১০০ হাজারেরও বেশি মানুষ কিভাবে ভ্রমে থাকেন?!

অবশেষে বেদনাক্লান্ত হৃদয়ে বলবো, এ পার্থিব জগতকে বেতালভাবে ভোগ করার বাসনা বিলাস থেকে স্রষ্টাকে অস্বীকারের প্রবণতা আজ বড় বেড়ে গেছে। কিন্তু অবিশ্বাসী নাস্তিকদের জেনে রাখা উচিত, এ জীবনের উচ্ছ্বাসিত কল্লোল একদিন থেমে যাবে। তখন অন্তিম মুহূর্তে ফ্যারাডের মত স্রষ্টাকে স্বীকার করার সুযোগ হয়ত নাও হতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক ও পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আমরণ সৃষ্টি সম্পর্কে নিজস্ব থিওরি গড়ে তোলেন। ১৮৬৭ সালের কোনো একদিন মাইকেলের অন্তিম মুহূর্তে তার এক বন্ধু প্রশ্ন করলেন, ফ্যারাডে! জীবনসায়াহে তোমার মতবাদ কী? -মতবাদ? না, এখন আর আমার নিজস্ব কোনো মতবাদ নেই। আল্লাহকে ধন্যবাদ। আমি আজ প্রকৃত সত্য জানতে পেরেছি!

সত্য কথা হলো আল্লাহকে কেউ যদি জোর করে অস্বীকার না করে, খোলা মন নিয়ে যদি বিশ্বচরাচরে দৃষ্টিপাত করে তাহলে তার কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না। আল্লাহ যেমন বলেছেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ﴾ [الانبیاء: ২২]

‘যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।’ (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ২২)

(মুফতি মাকসুদুর রহমান আল-মারুফের প্রবন্ধের সৌজন্যে)

এভাবে নাস্তিকরা জীবনসায়াহে এসে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করছে জীবদ্দশায় গোটা সমাজকে করতে থাকে কলুষিত। কারণ বিশ্বাসগতভাবে নাস্তিকরা বহুভাগে বিভক্ত হলেও রসুনের গোড়ার মতো সব নাস্তিকের চিন্তা এক জায়গায় মিল। আর তা হচ্ছে অবাধ নগ্নতা এবং পশুসম অশ্লীলতা। একটা পাঠা খুব সম্ভব তার মায়ের কাছে যায় না। কিন্তু নাস্তিক্যবাদ এমন এক জঘন্য মতবাদ, যেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এটা হচ্ছে

নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বড় কুফল। নাস্তিকদের দৃষ্টিতে সবকিছুই প্রাকৃতিক। তাই অন্য একটা মেয়ে যেমন প্রকৃতির মেয়ে, তেমনিভাবে তাদের চোখে মা, বোন, খালা এমনকি মেয়েও প্রকৃতির একটা মেয়ে। অতএব, দৈহিক সম্পর্কের বিবেচনায় সকলেই সমান! নাস্তিকদের চরিত্র, তাদের লেখা, আচরণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের এই হলো প্রতিচ্ছবি। নাস্তিক্যবাদের কুফল অনেক। ব্যভিচারকে ব্যাপকতা দেয়া নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে ছোট ও সাধারণ কুফল! আজ দেশে যেনা-ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া, পাপকে পাপ মনে না করার মহামারি দেখা দিয়েছে। এর বহুমাত্রিক কারণের অন্যতম হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের চর্চা। সমাজ ও জীবনব্যবস্থা ধ্বংসকারী এই মতবাদ গুঁড়িয়ে না দিলে দুর্ভোগ আবশ্যিক। কিন্তু উল্টো চলছে নাস্তিক্যবাদের পৃষ্ঠপোষণ, তোষণ ও লালন-পালন!

ঘটনা : বর্ষা। একটা মেয়ের নাম। সরাসরি সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিল এবিসি এফএম রেডিওতে। সাক্ষাৎকারে অকপটে বলে গেল জীবনের কথা। চাতুরি বা গোপন করার চেষ্টা করেনি মেয়েটি। লোকেরা তাই বলে মেয়েটা বেশ দুর্দান্ত সাহসী, অকুতোভয়!

বর্ষা তার জীবনকাহিনীর যে চিত্র উপস্থাপন করে তা সত্যিই হৃদয়বিদারক এবং অকল্পনীয়। হৃদয়বিদারক দেশের জন্য, দেশের নৈতিক অবস্থা এবং পাপাচার সহনীয়তা পাওয়ার জন্য।

বর্ষা জানায়, ঢাকায় বসবাসকারী তার পরিবার বেশ সম্পদশালী। সংসারে সৎমা আছে তার। এক খালা চট্টগ্রামের বাসিন্দা। মা-বাবা তাকে খালার কাছে চট্টগ্রামে পাঠায়। খালার বাসায় সে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। একদিন খালু তাকে বলে, বর্ষা! আমার না একটা বাচ্চা হবে এবং তা তোমার গর্ভে! কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ে বর্ষা। তা জানায় খালাকে। কী অদ্ভুত! খালা বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে বরং স্বাভাবিক স্বরে বলে, তাতে অসুবিধা কোথায়? তুই জানিস যে, তোর খালার সন্তান হচ্ছে না, তুই না হয় একটু আমাদের উপকার করলি, আমার হয়ে তুই তোর খালুর সন্তানটা পেটে ধারণ করলি, তাতে সমস্যা কোথায়!

খালা-খালুর কথাগুলো তীব্রভাবে বিদ্ধ হয় বর্ষার বুকে। কিন্তু উপায়হীন সে। কারণ, মাবাবা তাকে এখানেই রাখবেন। এই অক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নিলেন খালা-খালু। মেয়েটাকে নেশায় অভ্যস্ত করলেন। একদিন নেশাকাতর মেয়েটির গর্ভে আপন খালার ইশারা ও সমর্থনে খালু তার গর্ভে স্থাপন করলেন। বিষয়টি টের পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেল বর্ষা। গর্ভ ধারণের প্রায় ছয় মাস পর বান্ধবীদের সহযোগিতা নিয়ে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে সে। এরপর কিছুটা সুস্থ হয়ে ঢাকায় চলে আসে।

খালার পর এবার ফাঁদ পাতেন সৎমা। একদিন সৎমা তাকে চাকরি দেবেন বলে এক চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যান। চেয়ারম্যানের পছন্দ হয় বর্ষাকে। প্রথম দিনই হাতে অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আগামীকাল আমরা ব্যবসায়িক কাজে কক্সবাজারে যাবো। মতিঝিলে থেকে, তোমাকে অমুক মহিলা গাড়িতে তুলে নেবে। বর্ষার খটকা লাগল মনে। সে একজন সদ্য অভিজ্ঞতাশূন্য মেয়ে। কিন্তু কী এক মোহে সে শঙ্কিত হয়েও বাধা দিতে পারে না। তাই নির্দিষ্ট সময়ে মতিঝিলে দাঁড়ায় বর্ষা। মধ্যবয়সী এক মহিলা তাকে রিসিভ করে। তিনজন রওয়ানা হয় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে।

এক দামি হোটেলে ওঠে তারা। শুরু থেকে হোটেলে ওঠা পর্যন্ত সবকিছুই সন্দেহজনক মনে হয় বর্ষার কাছে। এসব ঘটনার সঙ্গে ব্যবসার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পায় না সে। হোটেলকক্ষে একাই কথাগুলো ভাবে বর্ষা। চিন্তিত হয় ভীষণভাবে। চিন্তায় ছেদ ঘটাতে মধ্যবয়সী মেয়েটি তার কক্ষে প্রবেশ করে ভূমিকা ছাড়াই বলে, বর্ষা! জানো, তোমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন? স্যারের সঙ্গে সেক্স করতে হবে! কথাগুলো শুনে মুষড়ে পড়ে বর্ষা। তার চিন্তা কমাতে মহিলা বলে, তুমি চিন্তা করো না। স্যার কাউকে একবারের বেশি ব্যবহার করেন না। তুমি এখান থেকেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

এরপর ঢাকায় ফিরে আসে বর্ষা। বাড়িতে এসে ভর্তসনা পায় মা, বাবা এবং গোটা সমাজ থেকে। জিদ চাপে তার। সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহী হয়ে শরীর বিক্রি করার কাজে নেমে পড়ে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদেশের মিডিয়াগুলো জাতিকে বেহায়া ও নগ্নাচারী হতে ভয়ানকভাবে উৎসাহিত করছে। যারা সাক্ষাৎকার দিতে আসে তাদের কাছ থেকে খুটিয়ে বের করছে শারীরিক সম্পর্কের কথা, কীভাবে হলো, কতবার হলো, কেমন অনুভূতি হলো- এসব প্রশ্ন করে বক্তা ও শ্রোতার সামনে ব্যভিচারকে একটা সাধারণকর্ম

হিসেবে দেখাতে চায়। তাদের এই আচরণে যেনা-ব্যভিচার এখন অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্ষার কাছ থেকে উপস্থাপক খুঁচিয়ে বের করেন, সে এপর্যন্ত প্রায় ১০০০ যুবকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ‘ইনকাম’ করেছে।

জীবনের এই ‘ভাঙাকুলা’ সচল রাখতে ইয়াবা ধরেছে। এমনকি এক যুবক তাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে হাজার হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়েছে। অনেক যুবক তাকে ভালোবাসার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অভিসার সমাপ্ত করে কলঙ্কিত এই মেয়েটির দিকে কেউ আর ভ্রক্ষেপ করেনি। মাঝখানে সে ভালো থাকতে তিনমাস সব অনৈতিক কাজ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু তখন নাকি সে কারো কাছ থেকে ভালো থাকার সাপোর্ট পায়নি। বাড়ির লোকজনও তাকে আর সাধারণভাবে গ্রহণ করেনি।

এভাবে অকপটে বর্ষা তার জীবনের গল্প লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে দ্বিধাহীন, সংকোচহীনভাবে উপস্থাপন করে গেল। পরের সপ্তাহে জমা পড়ল প্রায় আশিজন যুবকের আবেদন। তারা সবাই বর্ষাকে বিয়ে করতে চায়! জানি না, এটা কি ‘লিলখবীছিনা আলখবিছাত’, নাকি সহমর্মিতা কিংবা তাউস, সুলায়মান হাম্বলীর মতো খারাপ মেয়েদেরকে নিজের বুজরুকি দিয়ে ভালো করার চেষ্টা!

যেটাই হোক না কেন, বর্ষার অনেকগুলো ঘটনা আয়না হয়ে আমাদের সমাজব্যবস্থার নগ্নতা প্রকাশ করে দেয়। একটা সমাজ কী পরিমাণ দেউলিয়া হলে এভাবে একটা ব্যভিচারী মেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শ্রোতা বানিয়ে তার ব্যভিচারের কাহিনী প্রকাশ করে তা সহজেই অনুমেয়। আর একটা সমাজ কত নিচুতে নামলে একজন খালা আপন ভাঙ্গির গর্ভে নিজ স্বামীর ঔরস রাখতে উৎসাহিত করে তাও এই ঘটনায় স্পষ্ট।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অশ্লীলতাসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা যতই সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হচ্ছি; সমাজ-সংসারের কর্তাবাবুগণ ততই উদাসীনচিন্তে সবকিছু এড়িয়ে চলছেন এবং অকপটে হজম করে নিচ্ছেন। নারী নিয়ে সবচেয়ে বড় হোলি খেলা দেখালো নাস্তিক্যবাদের দোসররা। নারীদেরকে কীভাবে প্রকাশ্য রাজপথে জনসাধারণের খাদ্যে পরিণত করতে হয় তাও দেখিয়ে গেল ওরা কর্তাবাবুগণের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে। এতদিন মানুষ নাস্তিক্যবাদকে কেবলই স্রষ্টাদ্রোহী বলে জেনে এসেছে। কিন্তু ওরা যে নগ্নদস্যু ও চরিত্রবিধ্বংসী অভিসারীদল, সেটা ঘটা করে প্রকাশ পেলো সাম্প্রতিক সময়ের ওদের কর্মকাণ্ডে। তাই নাস্তিক্যবাদ কেবল আল্লাহর দুশমনই নয়, নারী ও সতীত্বেরও দুশমন। সমাজ ব্যবস্থা ও শান্তি-সম্প্রীতির জন্য এরা মারাত্মক বাধা। এই বাধার শিকড় না কাটলে নারীদের জন্য তাদের সতীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হবে। হয় যদি আমাদের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত শত্রু-মিত্র চিনতে পারত! আল্লাহর বাণীর অর্থ যদি বুঝত! আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْأَمْهَاتِ رِكَتٍ حَتَّى يُؤْفَاقَ مِنْهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْرَبْتُمْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْأَمْهَاتِ رِكَتَيْنِ حَتَّى يُؤْفَاقَ مِنْهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْرَبْتُمْكُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَتَذَكَّرُونَ ۚ﴾ [البقرة: ২২১]

‘আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুঞ্চ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুঞ্চ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জাহ্নাম ও

ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২২১)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10592>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন